

‘চলে আসুন ! চলে আসুন ! রকেট উড়বে !’

নকুড়চন্দ্রের সতর্কবাণী শুনে আমরা সবাই দৌড়ে গিয়ে পাথরের ঢিবির পিছনে আশ্রয় নিলাম, আর সেখান থেকেই দেখলাম, রকেট তার নীচের মাটি তোলপাড় করে দিয়ে ধুলো বালিতে সবেমাত্র ওঠা সূর্যকে ঢেকে দিয়ে প্রচণ্ড বেগে উপর দিকে উঠে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমরা ঢিবির পিছন থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেলাম যেখানে রকেট ছিল, সেই দিকে। একটা জিনিস দেখে মনে একটা সন্দেহ জেগেছিল, শেং-এর উল্লাসে সেটা বিশ্বাসে পরিণত হল।

এগিয়ে গিয়ে দেখি, ইউ.এফ.ও.-র দাপটে তাকুড়-মাকানের মাটিতে একটা প্রকাণ্ড গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, আর সেই গর্তের মধ্যে দেখা যাচ্ছে পাথরের গায়ে কারুকাজ করা এক সুপ্রাচীন সৌধের উপরের অংশ।

এটাই যে অষ্টম শতাব্দীর সেই বৌদ্ধ বিহার, সে সম্বন্ধে শেং-এরও মনে বোধ হয় কোনও সন্দেহ নেই।

আনন্দমেলা । পূজাবার্ষিকী ১৩৮৯



আশ্চর্য

আগস্ট ৭

আজ এক আশ্চর্য দিন।

সকালে প্রহ্লাদ যখন বাজার থেকে ফিরল, তখন দেখি ওর হাতে একটার জায়গায় দুটো থলি। জিজ্ঞেস করাতে বলল, ‘দাঁড়ান বাবু, আগে বাজারের থলিটা রেখে আসি। আপনার জন্য একটা জিনিস আছে, দেখে চমক লাগবে।’

আমার তেত্রিশ বছরের পুরনো প্রৌঢ় চাকর আমাকে চমক দেবার মতো কিছু আনতে পারে ভেবে আমার হাসি পেল। কী এনেছে সে থলিতে করে?

মিনিটখানেকের মধ্যে প্রশ্নের জবাব পেলাম, আর চমক যেটা লাগল সেটা যেমন তেমন নয়, এবং তার মাত্রা অনুমান করা প্রহ্লাদের কর্ম নয়।

থলি থেকে বার করে যে জিনিসটা প্রহ্লাদ আমার হাতে তুলে দিল সেটা একটা জানোয়ার। সাইজে বেড়ালছানার মতো। চেহারার বর্ণনা আমার মতো বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। প্রাণিবিদ্যা-বিদ্যারদের মতে পৃথিবীতে আন্দাজ দু’লক্ষ বিভিন্ন শ্রেণীর জানোয়ার আছে। আমি তার বেশ কিছু চোখে দেখেছি, কিছুর ছবি দেখেছি, আর বাকি অধিকাংশেরই বর্ণনা পড়ে জেনেছি তাদের জাত ও চেহারা কীরকম। প্রহ্লাদ আমাকে যে জন্তুটা দিল সেরকম জন্তুর বর্ণনা আমি কখনও পড়িনি। মুখ দেখে বানর শ্রেণীর জানোয়ার বলেই মনে হয়। নাকটা সাধারণ বাঁদরের চেয়ে লম্বা, কপাল বাঁদরের তুলনায় চওড়া, মাথাটা বড় আর মুখের নীচের দিকটা সরু। কান দুটো বেশ বড়, চাপা, এবং উপর দিকটা শেয়াল

কুকুরের কানের মতো ছুঁচোলো। চোখ দুটো মুখের অনুপাতে বড়ই বলতে হবে—যদিও লরিস বাঁদরের মতো বিশাল নয়। পায়ের প্রান্তভাগে খাবার বদলে পাঁচটা করে আঙুল দেখেও বাঁদরের কথাই মনে পড়ে। লেজের একটা আভাসমাত্র আছে। এ ছাড়া, গোর্ফ নেই, সারা গায়ে ছোট ছোট লোম, গায়ের রং তামাটে। মোটামুটি চেহারার বর্ণনা হল এই। মাথাটা যে বড় লাগছে, সেটা শৈশব অবস্থা বলে হতে পারে—যদিও শৈশব কথাটা ব্যবহার করলাম আন্দাজে। এমনও হতে পারে যে, এটা একটা পরিণতবয়স্ক জানোয়ার, এবং এর জাতই ছোট।

মোটকথা এ এক বিচিত্র জীব। প্রহ্লাদ বলল, এটা তাকে দিয়েছে জগন্নাথ। জগন্নাথ থাকে উশীর ওপারে বল্‌সি গ্রামে। সে নানারকম শিকড় বাকল সংগ্রহ করে গিরিডি়র বাজারে বেচতে আসে সপ্তাহে দু-তিনবার। আমিও জগন্নাথের কাছ থেকে গাছগাছড়া কিনে আমার ওষুধ তৈরির কাজে লাগিয়েছি। জগন্নাথ জন্তুটাকে পায় জঙ্গলে। সে জানে প্রহ্লাদের মনিবের নানারকম উদ্ভট জিনিসের শখ, তাই সে জানোয়ারটা আমার নাম করেই তাকে দিয়েছে।

‘কী খায় জানোয়ার, সে বিষয়ে বলেছে কিছু?’

‘বলেছে।’

‘কী বলেছে?’

‘বলেছে শাকসবজি ফলমূল ডালভাত সবই খায়।’

‘যাক, তা হলে তো কোনও চিন্তাই নেই।’

চিন্তা নেই বললাম, কিন্তু এত বড় একটা ঘটনা নিয়ে চিন্তা হবে না সে কী করে হয়? একটা সম্পূর্ণ নতুন জাতের প্রাণী, যার নামধাম স্বভাবচরিত্র কিছুই জানা নেই, যার কোনও উল্লেখ কোনও জন্তু জানোয়ারের বইয়েতে কখনও পাইনি, সেটা এইভাবে আমার হাতে এসে পড়ল, আর তাই নিয়ে চিন্তা হবে না? কেমনতরো জানোয়ার এটা? শান্ত না মিচকে খেঁকোথায় রাখব একে? খাঁচায়? বাক্সে? বন্দি অবস্থায় না ছাড়া অবস্থায়? একে দেখে আমার বুড়াল নিউটনের প্রতিক্রিয়া কী হবে? অন্য লোকে এমন জানোয়ার দেখলে কী বলবে?

একে নিয়ে কী করা হবে সেটা ভাবার আগে আমি জন্তুটাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করলাম। আমার কোল থেকে তুলে নিয়ে টেবিলের উপর রাখলাম ওটাকে। সে দিব্যি চুপচাপ বসে রইল, তার দৃষ্টি সটান আমার দিকে। ভারী অদ্ভুত এ চাহনি। এর আগে কোনও জানোয়ারের মধ্যে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এ চাহনিতে ভয় বা সংশয়ের কোনও চিহ্ন নেই, হিংস্র বা বুনোভাবে লেশমাত্র নেই। এ চাহনি কোন বুদ্ধিতে দিচ্ছে যে, আমার উপর তার গভীর বিশ্বাস; আমি যে তার কোনও অনিষ্ট করব না, সেটা সে জানে। এ ছাড়াও চাহনিতে যেটা আছে, সেটাকে বুদ্ধি ছাড়া আর কিছু বোঝায় না। সত্যি করেই জন্তুটা বুদ্ধিমান কি না, তার পরিচয় না পেলেও, তার চোখের স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তার মস্তিষ্ক সজাগ। সেই কারণেই সন্দেহ হচ্ছে যে, এ জন্তু হয়তো শাবক নয়। অবিশ্যি এর বয়সের হৃদিস হয়তো কোনওদিনও পাওয়া যাবে না। যদি দেখি এর আয়তন দিনে দিনে বাড়ছে, তা হলে অবিশ্যি বুঝতে হবে এর বয়স বেশি হতে পারে না।

আজ সকাল সাতটায় এসেছে জন্তুটা আমার কাছে; এখন রাত পৌনে এগারোটা। ইতিমধ্যে পশুসংক্রান্ত যত বই, এনসাইক্লোপিডিয়া ইত্যাদি আছে আমার কাছে, সবগুলো খেঁটে দেখেছি। কোনও জন্তুর বর্ণনার সঙ্গে এর সম্পূর্ণ মিল নেই।

সকালেই নিউটনের সঙ্গে জন্তুটার মোলাকাত হয়ে গেছে। আমার কফি খাবার সময় নিউটন আমার কাছে এসে বিস্কুট খায়। আজও এল। জন্তুটা তখনও টেবিলের উপরেই রাখা ছিল। নিউটন সেটাকে দেখেই দরজার মুখে থমকে দাঁড়াল। আমি দেখলাম তার লোম খাড়া হচ্ছে। জন্তুটার মধ্যে কিন্তু কোনও চাঞ্চল্য লক্ষ করলাম না। সে কেবল আমার দিক থেকে

বিড়ালের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছে। অবিশ্যি এই দৃষ্টির মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। খুব অল্পক্ষণের জন্য হলেও, তার মধ্যে একটা সতর্কতার আভাস ফুটে উঠেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিউটনের পিঠের লোমগুলো আবার বসে গেল। সে জানোয়ারের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে একটা ছোট্ট লাফে আমার কোলে উঠে বিস্কুট খেতে লাগল।

জন্তুটাকে মেপে রেখেছি। নাকের ডগা থেকে লেজের ডগা অবধি সাড়ে ন' ইঞ্চি। এটার ছবিও তুলে রেখেছি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। রঙিন ছবি, কাজেই পরে রং পরিবর্তন হলে বুঝতে পারব। খাওয়ার ব্যাপারে আজ আমি যা খেয়েছি তাই খেয়েছে, এবং সেটা বেশ তৃপ্তি সহকারে। আজ বিকেলে একবার আমি ওটাকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে বেড়াতে বেরিয়ে ছিলাম। একবার মনে হয়েছিল গলায় একটা বকলস পরিয়ে নিই, কিন্তু শেষপর্যন্ত হাতে করে তুলে নিয়ে গিয়ে ঘাসের উপর ছেড়ে দিলাম। সে আমার পাশেপাশেই হাঁটল। মনে হয় সে এর মধ্যেই বেশ পোষ মেনে গেছে। জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আমার বেশি সময় লাগে না এটা আমি দেখেছি। এর বেলান্তে সেটা বিশেষভাবে লক্ষ করলাম।

এখন আমি শোবার ঘরে বসে জায়গা লিখছি। জন্তুটার জন্য একটা প্যাকিংকেসের মধ্যে বিছানা করে দিয়েছি। মিনিটপ্যাঁচের হল নিজে থেকেই সে বাস্কের মধ্যে ঢুকেছে।

অকস্মাৎ আমার জীবনে এই নতুন সঙ্গীর আবির্ভাবে আমার মন আজ সত্যিই প্রসন্ন।

আগস্ট ২৩

আজ আমার কতকগুলো জরুরি চিঠি এসেছে; সে বিষয় বলার আগে জানিয়ে রাখছি যে, এই ষোলো দিনে আমার জন্তু আয়তনে নিউটনকে ছাড়িয়ে গেছে। সে এখন লম্বায় ষোলো ইঞ্চি, ওটার স্বভাবচরিত্রেরও কতকগুলো আশ্চর্য দিক প্রকাশ পেয়েছে, সে বিষয় পরে বলছি।

জন্তুটিকে পাবার দু'দিন পরেই তার ছবি সমেত পৃথিবীর তিনজন প্রাণিবিদ্যাশিষ্যদেরকে চিঠি লিখে পাঠিয়ে ছিলাম। কীভাবে এটাকে পাওয়া গেল, এবং এর স্বভাবের যেটুকু জানি সেটা লিখে পাঠিয়ে ছিলাম। এই তিনজন হলেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন ড্যাভেনপোর্ট, ইংলন্ডের স্যার রিচার্ড ম্যাক্সওয়েল, ও জার্মানির ড. ফ্রিডরিশ একহাট। তিনজনেরই উত্তর আজ একসঙ্গে পেয়েছি। ড্যাভেনপোর্ট লিখছেন—বোঝাই যাচ্ছে পুরো ব্যাপারটা একটা ধাপ্লাবাজি; এই নিয়ে তাঁকে যেন আমি আর পত্রাঘাত না করি। ম্যাক্সওয়েল বলছেন, জন্তুটা যে একটা হাইব্রিড তাতে কোনও সন্দেহ নেই। হাইব্রিড হল, দুটি বিভিন্ন জানোয়ারের সংমিশ্রণে উদ্ভূত একটি নতুন জানোয়ার। যেমন ঘোড়া আর গাধা মিলে খচ্চর। ম্যাক্সওয়েল চিঠি শেষ করেছেন এই বলে—‘পৃথিবীতে আনকোরা নতুন জানোয়ার আবিষ্কারের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সমুদ্রগর্ভে কী আছে না আছে তার সব খবর হয়তো আমরা জানি না, কিন্তু ডাঙার প্রাণী সবই আমাদের জানা। তোমার এই জন্তুকে অনেকদিন স্টাডি করা দরকার। এর স্বভাবে তেমন কোনও চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়লে আমাকে জানাতে পারো।’

ড. একহাট হচ্ছেন এই তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্ন। তাঁর চিঠিটা একটু বিশেষ ধরনের বলে সেটা সম্পূর্ণ তুলে দিচ্ছি।

একহাট লিখছেন—

প্রিয় প্রোফেসর শঙ্কু,

তোমার চিঠিটা কাল সকালে পেয়ে আমি সারারাত ঘুমোতে পারিনি। তুমি ছাড়া

অন্য কেউ লিখলে আমি সমস্ত ব্যাপারটা প্রতারণা বলে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে এ প্রশ্নই ওঠে না। কী আশ্চর্য এক জানোয়ার যে তোমার হাতে এসে পড়েছে সেটা আমি পঞ্চাশ বছর পশু সম্বন্ধে চর্চা করে বুঝতে পারছি। তোমার তোলা ছবিই এই জানোয়ারের অনন্যসাধারণতা প্রমাণ করে। আমি বুদ্ধ হয়েছি, তাই তোমার দেশে গিয়ে জানোয়ারটা দেখে আসা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু এক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থায় তোমার আপত্তি হবে কি না পত্রপাঠ লিখে জানাও। তুমি যদি ঐখানে আস তবে তার খরচ বহন করতে আমি রাজি আছি। আমার অতিথি হয়েই থাকবে তুমি। তোমার জানোয়ারের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আমি করব। আমি ঐসময় অসুস্থ, ডাক্তার আমাকে দু'মাস বিশ্রাম নিতে বলেছে। যদি নভেম্বর মাসে আসতে পার তা হলে খুব ভাল হয়। আমি তোমার সঙ্গে যথাসময়ে যোগাযোগ করব—অবিশ্যি যদি জানি যে, তোমার পক্ষে আসা সম্ভব হচ্ছে।

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করো।

ইতি

ফ্রিডরিশ একহাট

আমি এঁকে জর্নিয়ে দেব যে, আমার যাবার ইচ্ছে আছে—অবিশ্যি যদি আমার জন্তু বহাল তবীয়তে থাকে।

এবার জন্তুটার বিষয় বলি।

ক'দিন থেকেই লক্ষ করছি জন্তুটা আর আমার সামনে চুপচাপ বসে থাকে না। আমার সঙ্গে সে পরিত্যাগ করে না ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে যেন একটা স্বাধীন মনোভাব এসেছে। আমি যখন পড়ি বা লিখি তখন সে সারা ঘরময় নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করে। মনে হয় ঘরের জিনিসপত্র সম্বন্ধে তার বিশেষ কৌতূহল। আলমারির বই, ফুলদানির ফুল, টেবিলের উপর কাগজকলম দোয়াত টেলিফোন—সব কিছু সম্পর্কে তার অনুসন্ধিৎসা। এতদিন সে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে দেখেই সমস্তই ছিল, আজ হঠাৎ দেখি চেয়ার থেকে টেবিলে উঠে সে আমার ফাউন্টেনপেনটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে। এই নাড়াচাড়ার মধ্যে একটা বিশেষত্ব লক্ষ করলাম। তার বুড়োআঙুল কাজ করে মানুষ বা বাঁদরের মতোই। ডাল আঁকড়ে ধরে গাছে চড়ে খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে বলে বানরশ্রেণীর জানোয়ারের এই কেজো বুড়ো আঙুলের উদ্ভব হয়েছিল। একেও জঙ্গলে থেকে গাছে চড়তে হয়েছে সেটা বুঝতে পারলাম।

এ ছাড়া আরেকটা লক্ষ করার জিনিস হল—সে কলমটা দেখছে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে। বানরশ্রেণীর মধ্যে এক ওরাংওটাং, ও সময় সময় শিম্পাঞ্জিকে, কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে হাঁটতে দেখা যায়। গোরিলা দু'পায়ে দাঁড়িয়ে বৃকে চাপড় মারে বটে, কিন্তু সেই পর্যন্তই। আমার জন্তু কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ ধরে।

তারপর দাঁড়ানো অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে একটা কাগজ টেনে নিয়ে কলমটা দিয়ে তার উপর হিজিবিজি কাটতে শুরু করল। আমার চল্লিশ বছরের পুরনো অতি প্রিয় ওয়াটারম্যান কলম; পাছে তার নিবটা এই জন্তুর হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে যায় তাই বাধ্য হয়ে সেটাকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে সোফা ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেলাম। জন্তু যেন আমার উদ্দেশ্য অনুমান করেই হাত বাড়িয়ে কলমটা আমার হাতে দিয়ে দিল।

এই ঘটনা থেকে তিনটে নতুন কথা জানতে পারলাম জন্তুটা সম্পর্কে।

- ১) তার বুড়ো আঙুল মানুষ বা বাঁদরের মতো কাজ করে।
- ২) সে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে বাঁদরের চেয়ে বেশিক্ষণ।

৩) তার বুদ্ধি বানরশ্রেণীর বুদ্ধিকে অনেকদূর অতিক্রম করে যায়।
আরও কত কী যে শিখবে এই বিচিত্র জানোয়ারটিকে স্টাডি করে তা কে জানে?

সেপ্টেম্বর ২

জন্তুটা এ কদিনে আরও তিন ইঞ্চি বেড়েছে। এখন এর আয়তন মোটামুটি একটা মাঝারি সাইজের কুকুরের মতো। অথবা বছর চারেকের মানুষের বাচ্চার মতো। এটা বলছি, কারণ জন্তুটা এখন প্রায়ই দু'পায়ে হাঁটে, হাতে করে খাবার তুলে মুখে পোরে, দু'হাতে গেলাস ধরে দুধ খায়। শুধু তাই নয়, ওকে আর মাঠে নিয়ে যেতে হয় না। ও আমার বসতির মতো ব্যবহার করে। গত সপ্তাহে ওর জন্যে কয়েকটা রঙিন পেন্সিলুন করিয়েছি। সেগুলো পরতে ও কোনও আপত্তি করেনি। আজ তো দেখলাম নিজেই পা গলিয়ে পরার চেষ্টা করছে।

আরও একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করছি। সেটা হল, ঘরে কীসেবাবা হলে ও অতি মনোযোগ দিয়ে শোনে। শোনার সময় তার ভুরু কুঁচকে যায়—সেটা কনসেন্ট্রেশনের লক্ষণ। আমি জানি এটা অন্য কোনও জানোয়ারের মধ্যে দেখা যায় না। এটা বিশেষ করে লক্ষ্য করছিলাম যখন কাল অবিনাশবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলাম।

অবিনাশবাবু আমার প্রতিবেশী এবং বহুকালের আলাপী। এই একটি ভদ্রলোককে দেখলাম যিনি আমাকে কোনওরকম আমল দেননি। বা আমার কাজ সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল প্রকাশ করেন না। জন্তুটাকে দেখে তিনি ভুরু ঈষৎ কপালে তুলে কেবল বললেন, 'এটা আবার কী বস্তু?'

আমি বললাম, 'এটি একটা আনকোরা নতুন শ্রেণীর জানোয়ার। এর নাম ইয়ে।'

অবিনাশবাবু চুপ করে চেয়ে আছেন আমার দিকে। তারপর বললেন, 'কী হল—মনে পড়ছে না নামটা?'

'বললাম তো—ইয়ে।'

'ইয়ে?'

'ইয়ে। সেটা বাংলা ইয়েও হতে পারে, আবার ইংরিজি E.A. অর্থাৎ একস্ট্রিটারি অ্যানিম্যালও হতে পারে।

ইয়ে নামটা আমি গতকালই স্থির করেছি। ইয়ে বলে দু-একবার ডেকেও দেখেছি। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরানো থেকে মনে হয় সে ডাকে সাড়া দিচ্ছে।

'বাঃ, বেশ নাম হয়েছে,' বললেন অবিনাশবাবু, 'কিন্তু এ কিছু করবে টরবে না তো?'

জন্তুটা অবিনাশবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের বাঁ হাতের কবজিটা ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রিস্টওয়াচটা দেখছিল। আমি বললাম, 'আপনি কিছু না করলে নিশ্চয়ই করবে না।'

'হুঁ...তা এটাকে কি এখানেই রাখবেন, না জু গার্ডেনে দিয়ে দেবেন?'

'আপাতত এখানেই রাখব। এবং আপনাকে একটা অনুরোধ করব।'

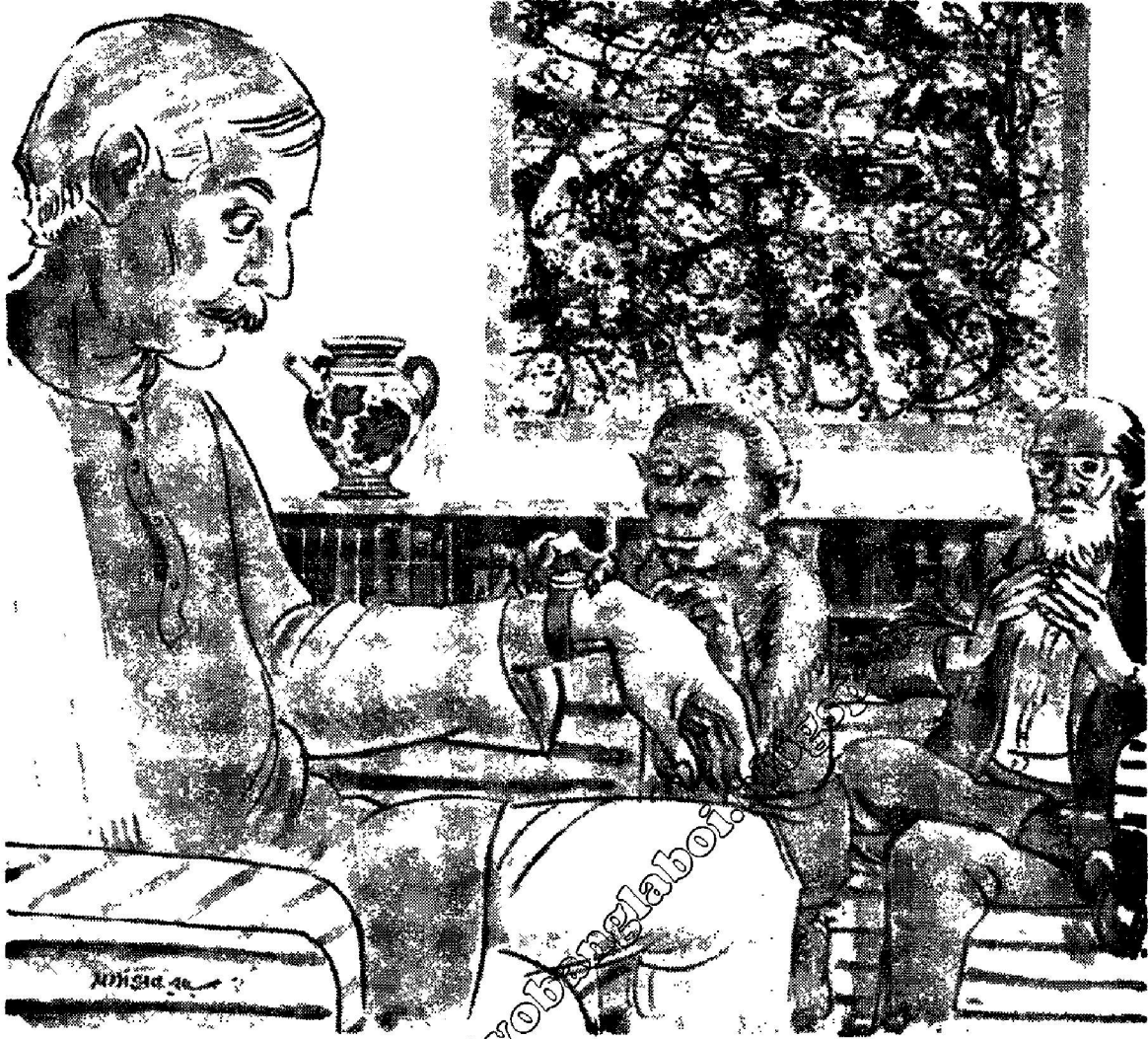
'কী?'

'আমার এই নতুন সম্পত্তিটি সম্বন্ধে দয়া করে কাউকে কিছু বলবেন না।'

'কেন?—অবিনাশবাবুর দৃষ্টিতে কৌতূকের আভাস—'যদি বলি আপনি একটি ইয়ে সংগ্রহ করেছেন তাতে দোষটা কী? ইয়েটা যে কী সেটা না বললেই হল!'

'এটা চলতে পারে।'

প্রহ্লাদ কফি এনে দিয়েছে, ইয়ে সোফায় ঠেস দিয়ে বসে ঠিক আমাদেরই মতো কাপের হাতলে ডান হাতের তর্জনী গলিয়ে দিয়ে সেটা মুখের সামনে ধরে চুমুক দিয়ে কফি খাচ্ছে।



এই অবাক দৃশ্য দেখেও অবিনাশকুবুর একমাত্র মন্তব্য হল, 'বোঝো!'
একটা মানুষের বিশ্বয়বোধ বলে কোনও বস্তু নেই, এটা ভাবতে অবাক লাগে।

সেপ্টেম্বর ৪

আজ এক আশ্চর্য ঘটনা ইয়ে সম্পর্কে আমার এতদিনের ধারণা তছনছ করে দিয়েছে।

দুপুরে আমার পড়ার ঘরে বসে সদ্য ডাকে আসা 'নেচার' পত্রিকার পাতা উলটে দেখছিলাম। ইয়ে আমার পাশের সোফাতে বসে একটা কাচের পেপারওয়েটে চোখ লাগিয়ে সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। এরই মধ্যে সে যে কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে টের পাইনি। হঠাৎ আমার ল্যাবরেটরি থেকে একটা বাস্ক উলটে পড়ার শব্দ পেয়ে ব্যস্তভাবে উঠে গিয়ে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখে কিছুক্ষণের জন্য চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেললাম।

বর্ষার সময় আমার বাগানে মাঝে মাঝে সাপ বেরোয়, সেটা আমি জানি। তারই একটা বোধ হয় বারান্দা দিয়ে আমার ল্যাবরেটরিতে ঢুকেছিল। যে সে সাপ নয়, একেবারে গোখরো। সেই সাপ দেখি এখন ইয়ের কবলে পড়েছে। সাপের গলায় দাঁত বসিয়ে আমার জন্তু তাকে ধরেছে মরণকামড়ে। আর সেইসঙ্গে সাপের লেজের আছড়ানি স্নে রোধ করেছে সামনের দু'পা দিয়ে।

ঘটনাটা চলল এক মিনিটের বেশি নয়। কারণ এই আসুরিক আক্রমণ যে সাপকে সহজেই পরাস্ত করবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

খোঁতলানো, মরা সাপটাকে ছেড়ে দিয়ে এবার ইয়ে পিছিয়ে এল। বিজয়গর্বে তার দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে, সেটা আমি ঘরের বিপরীত দিক থেকে শুনতে পাচ্ছি।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ইয়ের দাঁত আমি আগে পরীক্ষা করেছি; সে দাঁত দিয়ে এ-কাজটা অসম্ভব। কারণ মাংসাশী জানোয়ারের তীক্ষ্ণ স্ব-দন্ত বা কুকুরে-দাঁত ইয়ের ছিল না।

আর সাপের দেহ যেরকম ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, সে কাজটা করার মতো তীক্ষ্ণ নখ—যাকে ইংরেজিতে বলে ‘ক্ল’—সেও এ জন্তুর ছিল না।

প্রহ্লাদকে ডেকে সাপটা ফেলে দিতে বলে আমি ইয়ের দিকে এগিয়ে গেলাম।

‘ইয়ে, তোমার মুখটা হাঁ করো তো দেখি।’

বাধ্য ছেলের মতো এই আশ্চর্য জন্তু এককথায় আমার আদেশ পালন করল।

না। এমন দাঁত তো আগে ছিল না, হঠাৎ এর আবির্ভাব হল কী করে?

চার পায়ের বিশটা আঙুলে যে তীক্ষ্ণ নখ এখন দেখলাম, সে নখও আগে ছিল না।

কিন্তু বিস্ময়ের শেষ এখানেই নয়।

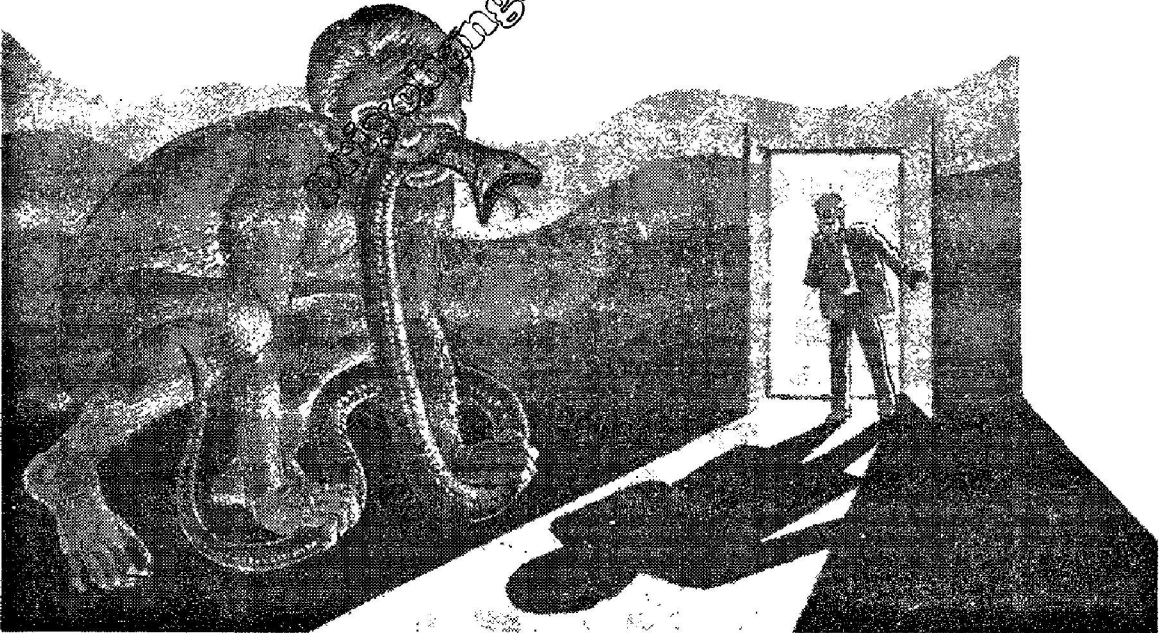
দশ মিনিটের মধ্যে নখ ও দাঁত আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল।

পশুবিজ্ঞান এই রহস্যের কোনও কিনারা করতে পারে কি? মনে তো হয় না।

নভেম্বর ১

কাল জার্মানি রওনা হব। আমাকে যেতে হবে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে আন্দাজ সত্তর কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে কোবলেনৎস শহরে। একহাটকে গত কুস্তিসের ঘটনাবলি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। সে দ্বিগুণ উৎসাহে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। যাতায়াতের সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। সাতদিন আমি একহাটের অতিথি হয়েই থাকব।

ইয়ের আয়তন গত দেড়মাসে আর বাড়ে নিশ্চয়ই ও তার বুদ্ধি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। আজকাল মাঝে মাঝে সে বই হাতে নিয়ে মাড়াটাড়া করে। তাকে চতুষ্পদ বলতেও দ্বিধা হয়।



কারণ অধিকাংশ সময়ই সে দু'পায়ে হাঁটে।

পর্যবেক্ষণের ফলে আরও যে কয়েকটি তথ্য ইয়ে সম্বন্ধে জানা গেছে সেগুলি নিম্নলিখিত
করছি—

১) বদলে যাওয়া পরিবেশের সঙ্গে দ্রুত খাপ খাইয়ে নেবার আশ্চর্য স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে
এ জন্তুর। সে জঙ্গল থেকে এলেও, মানুষের মধ্যে বাস করে তাঁর স্বভাব দিনে দিনে মানুষের
মতো হয়ে যাচ্ছে।

২) গোখরোর ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে শত্রুকে পরাস্ত করার অদ্ভুত ক্ষমতা
প্রকৃতি এই জানোয়ারকে দিয়েছে। বেজির স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে সাপকে বেকায়দায়
ফেলার। এ ব্যাপারে বেজির নখ ও দাঁত তার সাহায্য করে। ব্যাঙের সে ক্ষমতা নেই, তাই
ব্যাঙ সহজেই সাপের শিকারে পরিণত হয়। একদিন হঠাৎ যদি সাপের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য
ব্যাঙের নখ ও দাঁত গজায় তা হলে সেটা যত আশ্চর্য ঘটনা হবে, আমার জন্তুর সহসা নখ দন্ত
উদগমও সেইরকমই আশ্চর্য ঘটনা। আমি জানি, আবার যদি তাকে সাপের সামনে পড়তে হয়,
তা হলে আবার তার নখ ও দাঁত গজাবে।

৩) এই জানোয়ারের জাতটাই হয়তো বোবা, কারণ এই ক'মাসে একটিবারের জন্য সে
কোনওরকম শব্দ করেনি।

নভেম্বর ৪

ইয়ে আরেকবার চমকে দিয়েছে আমাকে।

আমি ওর জন্য একটা বাস্তু তৈরি করিয়ে নিয়েছিলাম, যেটা এয়ারওয়েজের কর্তৃপক্ষদের
সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা করে প্লেনের লেজের দিকে ক্যাবিনের মধ্যেই রাখা হয়েছিল। ফ্রাঙ্কফুর্ট
পৌঁছানোর দশ মিনিট আগে আমি ইয়ের কাছে গিয়েছিলাম তাকে একটা গরম কোট পরিয়ে
দেব বলে। গিয়ে দেখি ইয়ের চেহারা বদলে গেছে; তার সর্বাঙ্গে প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা লোম
গজিয়ে তাকে বরফের দেশে বাসের উপযুক্ত করে দিয়েছে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থার আরেকটা
জলজ্যাস্ত প্রমাণ।

ফ্রাঙ্কফুর্টে নেমে দেখি আশি বছরের বৃদ্ধ ড. এক্‌হাট নিজেই এসেছেন আমাকে রিসিভ
করতে। এয়ারপোর্টে আর ইয়েকে বাস্তু থেকে বার করলাম না, কারণ ওরকম সৃষ্টিছাড়া
জানোয়ারকে দেখতে যাত্রীদের মধ্যে হইচই পড়ে যেত। এক্‌হাট অবিশ্যি পুলিশের বন্দোবস্ত
করেছিলেন। তা ছাড়া কোনও সাংবাদিক বা ফোটোগ্রাফারকে আমার আসার খবরটা দেননি।

এক্‌হাটকে দেখে বলতে বাধ্য হলাম যে, তাঁর বয়স যে আশি সেটা বোঝার কোনও উপায়
নেই। সত্যি বলতে কী, পঞ্চাশ-বাহান্নর বেশি মনে হয় না। এক্‌হাট হেসে বললেন যে, সেটা
জার্মানির আবহাওয়ার গুণ।

পথে গাড়িতে ভদ্রলোককে ইয়ের লোম গজানোর খবরটা দিলাম। এক্‌হাট বললেন,
'তোমার জানোয়ারের বিষয় যতই শুনছি ততই আমার বিস্ময় বাড়ছে। আমি ইচ্ছা করেই অন্য
কোনও প্রাণিবিদ বা বৈজ্ঞানিককে তোমার আসার খবরটা দিইনি, কারণ তাদের সঙ্গে কথা
বলে বুঝেছি যে, তারা ভারতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপারটা বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে না।
তাদের কাছে ইন্ডিয়া এখনও রোপ-ট্রিক আর স্নেক-চার্মারের দেশ।'

এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা কোবলেনৎস পৌঁছে গেলাম। শহরের বাইরে অত্যন্ত মনোরম
পরিবেশে এক্‌হাটের বাসস্থান। আমি জানতাম যে, এক্‌হাটের পরিবার জার্মানির সবচেয়ে
সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্যতম। বাড়ির ফটকে 'প্লস এক্‌হাট' অর্থাৎ এক্‌হাট কাস্‌ল ফলক তার



সাক্ষ্য বহন করছে। কাস্লে'র চারিদিক ঘিরে নর্সিন গাছে ভরা বিস্তীর্ণ বাগান, তাতে গোলাপের ছড়াছড়ি। বাড়িতে প্রবেশ করার অক্ষিণই একহাট জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর স্ত্রী বছরচারেক হল মারা গেছেন, এখন বাড়িতে থাকেন চাকরবাকর ছাড়া একহাট নিজে এবং তাঁর মহিলা সেক্রেটারি। সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই মহিলাটির সঙ্গে আলাপ হল। নাম এরিকা ওয়াইস। চেহারায় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পেলেও, তার সঙ্গে একটা উদাস ভাব লক্ষ করলাম।

বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই বাস থেকে ইয়াকে বার করলাম। সে তৎক্ষণাৎ করমর্দনের ভঙ্গিতে একহাটের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বলেই হয়তো একহাটের হাতটা তৎক্ষণাৎ প্রসারিত হল না। সেই অবসরে ইয়ে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল সেক্রেটারির দিকে। শ্রীমতী ওয়াইসের চোখে বিস্ময় ও পুলকের দৃষ্টি আমি ভুলব না। জানোয়ারের প্রতি

প্রকৃত মমত্ববোধ না থাকলে এ জিনিস হয় না।

একহাট বললেন, 'আমার কুকুরদুটোকে আপাতত বন্দি করে রেখেছি। কারণ তোমার এ জানোয়ারকে দেখে তাদের কী প্রতিক্রিয়া হবে বলা মুশকিল।'

আমি বললাম, 'আমার বিশ্বাস তোমার কুকুর যদি সভ্যভব্য হয় তা হলে কোনও দুর্ঘটনা ঘটবে না, কারণ আমার বেড়াল আমার জন্তুকে খুব সহজভাবে গ্রহণ করেছে।'

হাঁটতে হাঁটতে বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকতেই একটা দৃশ্য দেখে কেমন যেন থমকে গেলাম।

এ কি প্রাণিতত্ত্ববিদের বাড়ি, না প্রাণিতত্ত্ববিদের কার্যালয়? ঘরের চারিদিকে এত জন্তুজানোয়ারের স্টাফ করা মাথা আর দেহ শোভা পাচ্ছে কেন?

একহাট হয়তো আমার সিনের ভাবটা আন্দাজ করেই বললেন, 'আমার বাবা ছিলেন নামকরা শিকারি। এসব জন্তুরই কীর্তি। এই নিয়ে বাপের সঙ্গে আমার বিস্তর কথা কাটাকাটি হয়েছে।'

ইয়ে ঘুরে ঘুরে জন্তুগুলো দেখছিল। চা আসার পর সে-ও আমাদের সঙ্গে সোফায় বসে পেয়লা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে লাগল। একহাটের দৃষ্টি বারবার তার দিকে চলে যাচ্ছে সেটা আমি লক্ষ্য করছিলাম। ইয়ে যে ভারতীয় ভেলকি বা ধান্নাবাজি নয় সেটা আশা করি ও বুঝেছে। কিন্তু আশি বছর বয়সে সে এমন স্বাস্থ্য কীকরে রেখেছে সেটা এখনও আমার কাছে দুর্ভেদ্য। আলাপ আরেকটু জমলে পর এর রহস্যটা কী সেটা জিজ্ঞেস করতে হবে।

চা-পান শেষ হলে পর একহাট সোফা থেকে উঠে পড়ে বললেন, 'আজকের দিনটা তুমি বিশ্রাম করো। তোমাদের ঘর দেখিয়ে দেবে এরিকা। কাল সকালে ব্রেকফাস্টের সময় আমার একটি পশুপ্রেমিক বন্ধুর সঙ্গে তোমার আলাপ হবে। আমার বিশ্বাস তাকে তোমার পছন্দ হবে।'

আমার দুটো সুটকেস একহাট-ভৃত্য আগেই আমার ঘরে নিয়ে গিয়েছিল, এবার কার্পেটে মোড়া বাহারের সিঁড়ি দিয়ে এরিকার সঙ্গে আমি গেলাম দোতলায়। থাকার ব্যবস্থা উত্তম। দুটি পাশাপাশি ঘর, একটিতে আমি, একটিতে ইয়ে। জানোয়ার কী খাবে জিজ্ঞেস করতে এরিকাকে বললাম, 'আমরা যা খাই তাই খাবে। ওকে নিয়ে কোনও চিন্তা নেই।'

এরিকা শুনে একটা নিশ্চিত্তভাব করার পরমুহুর্তেই তাঁর চাহনির উপর যেন একটা সংশয়ের পর্দা নেমে এল। তিনি যেন কিছু বলতে চান, কিন্তু ইতস্তত করছেন।

'আর কিছু বলার আছে কি?' আমি আশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করলাম।

'মানে ভাবছিলাম...তোমার কাছে কোনও অস্ত্র আছে কি?'

'কেন, এখানে কি চোরডাকাতের উপদ্রব হয় নাকি?'

'না, তা নয়, কিন্তু...ভাবছিলাম...তোমার জন্তুর তো একটা প্রোটেকশন দরকার। এমন আশ্চর্য প্রাণী...'

'ভয় নেই, আমার পিস্তল আছে।'

'পিস্তল?'

পিস্তল শুনে এরিকা ভরসা পেলেন না। বোধ হয় বন্দুক কি স্টেনগান বললে আরও আশ্বস্ত হতেন।

আমি আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তলের মহিমা আর এঁর কাছে প্রকাশ করলাম না। শুধু বললাম, 'ভয় নেই। পিস্তলই যথেষ্ট।'

ভদ্রমহিলা চাপাকণ্ঠে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন। মনে একটা সামান্য খটকার অনুপ্রবেশ রোধ করতে পারলাম না। যদিও জানি যে আমার পিস্তলের মতো ব্রস্মাস্ত্র আর দ্বিতীয় নেই।

ইয়ে ইতিমধ্যে নিজে থেকেই তার ঘরে চলে গেছে। গিয়ে দেখি সে জানালা দিয়ে বাইরের

দৃশ্য দেখছে। আশা করি তার মনে কোনও উদ্বেগ নেই। এই অবোলা জীবের মন বোঝা সব সময় আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। তার যদি কোনও অনিষ্ট হয় তা হলে আমার অবস্থা হবে শোচনীয়। এই ক'মাসে তার উপর গভীর মায়া পড়ে গেছে।

নভেম্বর ৬

আজ কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে। তার সঙ্গে কিছু চমক লাগাবার মতো ঘটনাও ঘটেছে, এবং সেটা, বলা বাহুল্য, ইয়াকে কেন্দ্র করে।

কাস্পার মাক্সিমিলিয়ান হেলব্রোনার—এই গালভরা নামের অধিকারী হলেন একহাটের বন্ধু। তবে ঐকে আমি কাস্পার বলেই উল্লেখ করব। কারণ একহাটও তাঁকে ওই নামেই ডাকেন। একহারা, ঢাঙা চেহারা, মাংসের অভাবে চোয়াল ও চিবুকের হাড় বেরিয়ে মুখে একটা পাথুরে ভাব এনেছে, তার সঙ্গে রয়েছে একজোড়া ঘন ভুরু আর একমাথা কদমছাঁট চুল। চেহারা দেখলে সম্ভ্রমের চেয়ে শঙ্কাই হয় বেশি; ইনি যে কখন কী করে বসবেন বলা যায় না।

একহাট ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, ‘কাস্পার আমার অনেককালের বন্ধু। জন্তুজানোয়ার সম্পর্কে ইনি বিশেষ উৎসাহী ও ওয়াকিবহাল।’

ইয়ে অবশ্য আমার সঙ্গেই ছিল। কাস্পার তার দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কেবল একটি মন্তব্যই করলেন—‘হোয়াট এককুইজিট ফার!’

ইয়ের গায়ের লোম যে অতি মসৃণ এবং সুদৃশ্য সেটা সকলেই স্বীকার করবে। বিশেষ করে গোলাপির মধ্যে এমন হলুদের আভা আর কোনও জানোয়ারের লোমে আমি দেখিনি।

কিন্তু লোমের প্রতি কাস্পার সাহেবের এই লোলুপ দৃষ্টি আমার মোটেই ভাল লাগল না। এই লোমের জন্য কত নিরীহ প্রাণীকে যে হত্যা করা হয়ে থাকে—বিশেষত পশ্চিমে—তার হিসেব নেই। চিঞ্চিলা নামে একটি ইঁদুরজাতী জানোয়ার আছে, তার লোম অভিজাত মেমসাহেবদের এত প্রিয় যে, একটি জানোয়ারের লোমের জন্য তাঁরা দশ-বিশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত। মনে মনে বললাম, হে ঈশ্বর, লোমব্যবসায়ীর দৃষ্টি যেন আমার এই জন্তুটির উপর না পড়ে।

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে বাকি কথা হল। ইয়াকে টেবিলে বসে খেতে দেখে কাস্পার বললেন, ‘আশ্চর্য ট্রেনিং দিয়েছ তুমি তোমার জানোয়ারকে! এ যে দেখছি শিম্পাঞ্জিকেও হার মানায়।’

আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, ইয়ে যা করেছে তার কোনওটাই আমি তাকে শেখাইনি। আসলে ওর পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণের ক্ষমতা অসাধারণ।

‘পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ খাপ খাইয়ে নেবার যে কথটা তুমি বলছিলে, তার কোনও নমুনা দেখাতে পার কি?’

আমি মৃদু হেসে বললাম, ‘আমি তো ওকে ডিমনস্ট্রেশন দেবার জন্য আনিনি। সেটা যদি তোমার সামনে আপনা থেকেই ঘটে তা হলেই দেখতে পাবে। আসলে সব প্রাণীকেই প্রকৃতি আত্মরক্ষার কতকগুলো উপায় সমেত সৃষ্টি করে। বাঘের গায়ের ডোরা আর বুটি তাদের জঙ্গলের গাছপালার মধ্যে প্রায় অদৃশ্য হয়ে মিশে থাকতে সাহায্য করে। তা ছাড়া এক জানোয়ার যাতে সহজে অন্য জানোয়ারের শিকার না হয়ে পড়ে তারও ব্যবস্থা থাকে। শজারুর কাঁটা অনেক জাঁদরেল জানোয়ারকেও বেকায়দায় ফেলে দেয়। অনেক জানোয়ারের গায়ের উগ্র গন্ধ তাদের শত্রুদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে। যারা অপেক্ষাকৃত নিরীহ জানোয়ার—

যেমন হরিণ বা খরগোশ—প্রকৃতি তাদের দিয়েছেন দ্রুতবেগে পলায়নের ক্ষমতা। অবিশ্যি এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। সব জানোয়ার শত্রুর হাত থেকে সমান নিরাপদ নয়।’

‘তুমি বলছ তোমার এই জন্তু আত্মরক্ষার উপায় জানে?’ প্রশ্ন করলেন কাস্পার।

আমি বললাম, ‘তার দুটো পরিচয় আমি পেয়েছি। গোখরো সাপের আক্রমণ থেকে সে যে শুধু নিজেকে বাঁচিয়েছে তা নয়, সাপকে সে যুদ্ধে পরাজিত করেছে। আর শীতের প্রকোপ থেকে সে কীভাবে নিজেকে বাঁচিয়েছে সে তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। আত্মরক্ষার তাগিদেই ক্রমবিবর্তনের ফলে যে পৃথিবীর প্রাণীর রূপ পালটেছে সে তো জানোই। আদিম জলচর প্রাণীই জলের যখন অর্ধেক হল তখন প্রথমে হল উভচর। তারপর স্থলচর। সরীসৃপের ডানা গজিয়েই হল প্রথম উড়ন্ত জানোয়ার—সেও তো পরিবেশ বদলের জন্যই। এসব পরিবর্তন হতে কোটি কোটি বছর লেগেছিল। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোটা তো চোখের নিমেষে হুজুর্জী!’

‘কিন্তু তোমার জানোয়ারের ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে?’ বললেন কাস্পার।

‘তাই কেউ দেখলাম চোখের সামনে।’

কথায় কাস্পার বিশ্বাস করলেন বলে মনে হল না। আমি ভেবেছিলাম একহাট আমাকে সমস্যাট করবেন, কিন্তু তাঁকেও অকুণ্ঠিত দেখে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলাম।

প্রাতরাশের পর একহাট প্রস্তাব করলেন তাঁর বিস্তীর্ণ বাগানটা একটু ঘুরে দেখে আসার জন্য। রাত্রে তুষারপাতের ফলে সেই বাগানে এখন বরফের গালিচা বিছানো রয়েছে, সেটা সকালে উঠে জানালা দিয়ে দেখেছি।

আমি প্রস্তাবে আপত্তি করলাম না।

বাগানটা যে কতখানি জায়গা জুড়ে তা আমার ধারণা ছিল না। অবিশ্যি সবটাকেই বাগান বললে ভুল হবে। ফুলগাছের পাট কিছুদূর গিয়েই শেষ হয়ে গেছে, তারপর সবই বড় বড় গাছ, তার মধ্যে অধিকাংশই পাইন জাতীয়। এটাকে বন বললেই ঠিক বলা হবে।

আমি একহাটকে প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ে একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় জানোয়ারের কণ্ঠস্বর শুনে সেটা আর করা হল না।

হাউন্ডের ডাক। অ্যালসেশিয়ান।

‘হানসেল আর গ্রেটেলও দেখছি বেড়াতে বেরিয়েছে,’ বললেন একহাট।

আমি প্রথমে ইয়ের হাত ধরে হাঁটছিলাম, তারপর নিজেই হাতটা ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখন তার দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখি তার ভুরু কুঁচকে গেছে।

এবার প্রায় একশো গজ দূরে কুকুরদুটোকে দেখতে পেলাম। দুটোর গলাতেই বকলস, চামড়ার দড়ি একহাটের চাকরের হাতে ধরা।

কুকুর আর আমরা পরস্পরের দিকে এগিয়ে চলেছি। দূরত্ব যখন আন্দাজ ত্রিশ গজ, তখন অ্যালসেশিয়ান দুটো থেমে গেল, তাদের দৃষ্টি সটান ইয়ের দিকে। আমরা চারজনেও থেমে গেছি। আমি ইয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাতটা ধরে নিলাম। কাস্পার ও একহাট বুঝতেই পারছি, ঘটনা কোন দিকে যায় তাই দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন।

দুটো কুকুরের দড়িতেই যে টান পড়ছে সেটা আমি লক্ষ করছিলাম, আর সেইসঙ্গে মৃদু হুংকারও শুনতে পাচ্ছিলাম মাঝে মাঝে।

হঠাৎ প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টানে একহাট-ভৃত্যকে বরফের উপর ফেলে দিয়ে হানসেল আর গ্রেটেল ছুটে এল আমাদের দিকে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার হাতে একটা টান অনুভব করতে দেখলাম ইয়ে বিদ্যুৎবেগে বাঁ দিকে ছুটে গিয়ে একটা তুষারাবৃত ঝোপের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।



সে ভয় পেয়েছে। এই জোড়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করার ক্ষমতা প্রকৃতি তাকে দেয়নি।
প্রায় যন্ত্রের মতোই আমিও ছুটে গেলাম ইয়ের পিছনে, আর আমার পিছনে একহাট ও
কাস্পার।

কুকুর দুটোর হিংস্র চাহনি আগেই লক্ষ করেছিলাম; এবার দেখলাম শিকারের লোভে
তাদের পাগলের মতো ছোটাছুটি। তারা হন্যে হয়ে খুঁজছে আমার জন্তকে।

আমি প্রমাদ গুনলাম। বাধ্য হয়ে চেষ্টা করে বলতে হল, ‘দোহাই ড. একহাট, আপনার
কুকুরদুটোকে থামান।’

‘ইম্পসিবল,’ রুদ্ধস্বরে বললেন একহাট, ‘এ অবস্থায় ওদের থামানো ভগবানের অসাধ্য।’

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার—যেদিকে ইয়ে গিয়েছিল সেইদিকেই গিয়েছে কুকুরদুটো, কিন্তু
আমার সেই পোষা অনুগত জানোয়ারের কোনও চিহ্ন নেই।

প্রায় পাঁচ মিনিট উদ্দাম দাপাদাপির পর হানসেল আর গ্রেটেল হাল ছেড়ে দিয়ে জিভ বার
করে হাঁপাতে লাগল, আর তাদের পরিচালক এগিয়ে গিয়ে কুকুরের গলার দড়ি হাতে তুলে

নিল।

‘ওদের বাড়িতে নিয়ে যাও’, হুকুম করলেন এক্‌হাট।

‘কিন্তু তোমার জানোয়ার কোথায় উধাও হল?’ প্রশ্ন করলেন কাস্পার।

আমিও অবিশ্যি সেই কথাই ভাবছিলাম। অথচ আশেপাশে মাটিতে গর্ত বা গাছের গায়ে ফোকরও নেই যাতে তার ভিতর লুকোনো যায়।

কুকুরদুটো প্রায় বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছোনের পর আত্মপ্রকাশ করলেন আমার আশ্চর্য জানোয়ার।

কিন্তু এ কী হয়েছে তার চেহারা? সে কি এতক্ষণ বরফে গড়াগড়ি করেছে?

না, তা নয়। তার গায়ের রং, তার চোখের মণি, তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ হয়ে গেছে ধবধবে সাদা। সে এখন একটা তুষারপিণ্ডের সামিল। এই অবস্থায় এই পরিবেশে তাকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

‘গট ইন হিমেল!’ চৈচিয়ে উঠলেন কাস্পার। হ্যাঁ, ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ এই অবস্থায় স্বাভাবিক। এমন আশ্চর্য ঘটনা দুই জার্মান নিশ্চয়ই কোনওদিন দেখেননি।

আমরা চারজন আবার এক্‌হাট কাস্পারের ফিরে এলাম। সবাই মিলে সোফায় বসতে কাস্পারই প্রথম মুখ খুললেন।

‘তোমার এই মহামূল্য সম্পত্তির ভবিষ্যৎ কী তা তুমি স্থির করেছ?’

সহজ উত্তর। বললাম, ‘আমি সন্তান বেঁচে আছি ততদিন ওকে আমার কাছে রাখব। ও আমার সঙ্গী। এই ক’মাস আমিই ওকে প্রতিপালন করেছি।’

‘কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসেবে বিশ্বের প্রাণিবিদদের প্রতি তোমার কোনও দায়িত্ব নেই? তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাও তোমার এই জন্তুকে?’

‘লুকিয়ে রাখতে চাইলে আমি তাকে এখানে এনেছি কেন? ভবিষ্যতে তাকে কেউ দেখতে চাইলে আমার দেশে আমার বাড়িতে আসতে পারেন। আমার দরজা খোলাই থাকবে। জন্তু আমার কাছে নিরাপদে থাকবে। এখানে এনে কী হল তা তো দেখলেন। এরকম ঘটনা যে আরও ঘটবে না তার কী বিশ্বাস?’

‘কোনও পশুশালায় রাখতে আপত্তি কী?’

‘সেটা রাখলে আমার নিজের দেশের পশুশালাতেই রাখব। কলকাতার চিড়িয়াখানা নেহাত নিন্দের নয়।’

‘হুঁ...’

কাস্পার উঠে পড়লেন।

‘ঠিক আছে। আমি তা হলে আসি। আমার একটা প্রস্তাব ছিল, সেটা বোধ হয় তুমি গ্রহণ করবে না। আমি আর এক্‌হাট মিলে তোমাকে বিশ হাজার মার্ক দিতে রাজি আছি তোমার ওই জন্তুর জন্য। আমাদের দিলে সারা পৃথিবী ওর অস্তিত্ব জানতে পারবে। তার ফলে তোমার নামটাও অমর হয়ে থাকত। কারণ তুমিই যে ওটা দিয়েছ আমাদের, সেকথা আমরা গোপন রাখতাম না।’

‘তুমি ঠিকই অনুমান করেছ। এ প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারব না।’

কাস্পারের সঙ্গে এক্‌হাটও বেরিয়ে গেলেন, বোধ হয় বন্ধুকে গাড়িতে তুলে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হল।

শ্রীমতী এরিকা ওয়াইস! চোখেমুখে গভীর উদ্বেগের চিহ্ন।

‘তুমি একা আছ,’ বললেন শ্রীমতী ওয়াইস, ‘তাই তোমাকে একটা কথা বলে যাই। প্রাণিবিদ এক্‌হাটের মৃত্যু হয়েছে এক মাস আগে। তিনিই তোমাকে প্রথম চিঠিটা লিখেছিলেন। ইনি



তাঁর ছেলে। ঐরও নাম ফ্রিডরিশ। ইনি শিকারি। জুজুজানোয়ারের প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা নেই। তুমি কালই চলে যাও এখান থেকে। আমি তোমার টিকিটের বন্দোবস্ত করে দেব। এখানে থাকা নিরাপদ নয়।’

‘কিন্তু তুমি তা হলে কার সেক্রেটারি?’

‘ঐর নয়, ঐর বাবার। আমি কতকগুলো কাজ শেষ করে এক সপ্তাহের মধ্যেই চলে যাব।’

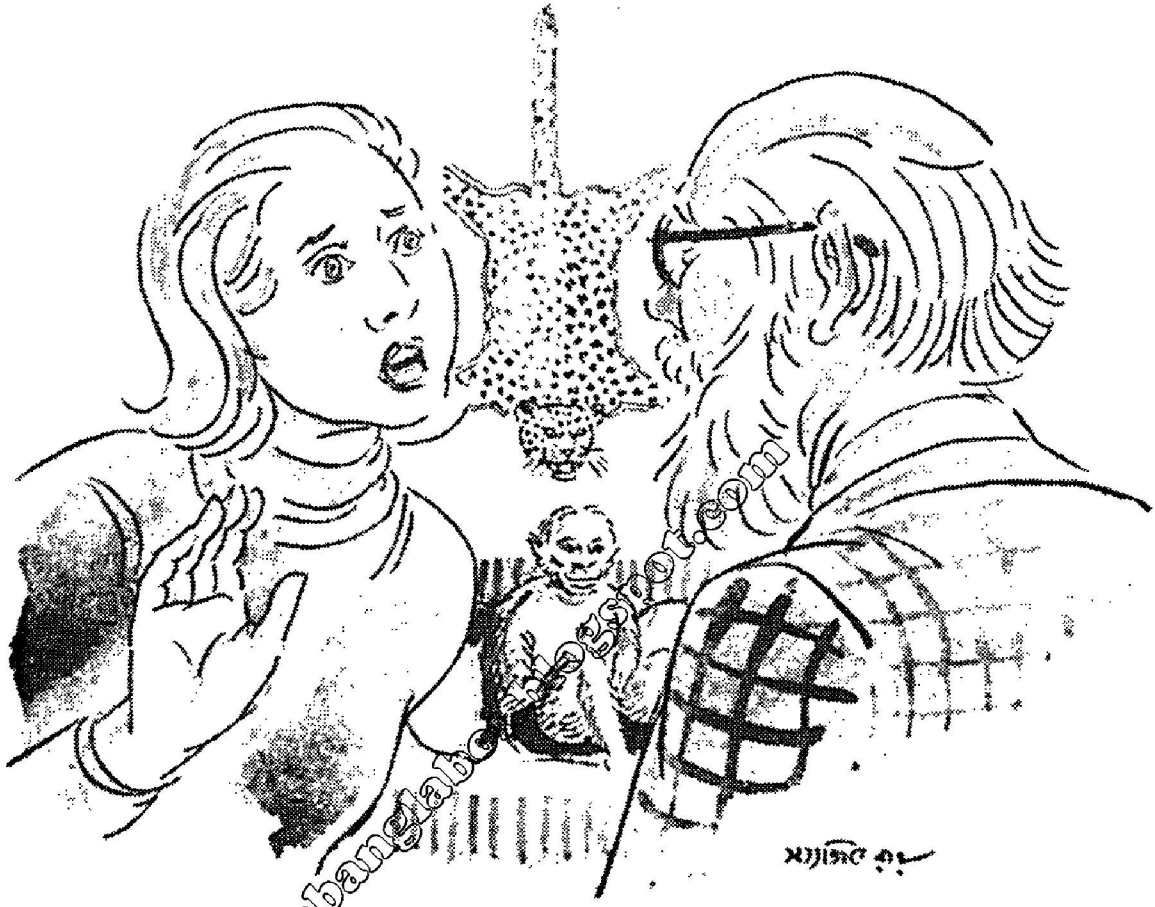
‘আর কাস্পার ভদ্রলোকটি কে?’

‘ওডিয়ন সার্কাসের মালিক। সার্কাসের সঙ্গে একটা পশুশালা আছে, তাতে নানারকম উদ্ভট জানোয়ার—’

বাইরে জুতোর শব্দ। এরিকা পাশের দরজা দিয়ে নিঃশব্দে প্রস্থান করলেন।

‘তোমাকে আজ আর বিরক্ত করব না,’ ঘরে এসে বললেন একহাট। ‘আমাদের প্রস্তাবের কথাটা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো। কাল সকালে আবার তোমার সঙ্গে বসব।’

একহাট চলে গেলেন। এতক্ষণ ইয়ের দিকে দৃষ্টি দিইনি, এবার চেয়ে দেখি সে আবার পূর্ব



অবস্থায় ফিরে এসেছে।

এখন রাত এগারোটা বাজে। ইয়ের ঘরে গিয়ে দেখে এসেছি সে ঘুমোচ্ছে। আজকের অভিজ্ঞতাটা কি তার কাছে একটা বিভীষিকা, নাকি সে এজাতীয় ঘটনা উপভোগ করে? যে কোনও প্রাণীই জন্মগ্রহণ করে দুটি প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে—এক হল আত্মরক্ষা, আর দুই, খাদ্য আহরণ করে দেহের পুষ্টিসাধন করা। দ্বিতীয়টার ব্যাপারে ইয়ের আপাতত কোনও সমস্যা নেই—অন্তত আমার কাছে সে যতদিন আছে; আর প্রথমটি যে সে অনায়াসেই করতে সক্ষম, তার প্রমাণ তো পাওয়াই গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, আজ এরিকা যে বিপদের কথা বললেন, সেটা কী ধরনের বিপদ? জানোয়ারের সঙ্গে ইয়ে যুক্ত হতে পারে, কিন্তু মানুষের চক্রান্তের বিরুদ্ধে তার শক্তি কতটুকু তা তো জানা নেই!

এ বিষয়ে কাল ভাবা যাবে। দেখি কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

নভেম্বর ৭

কাল রাতের চরম শিহরন জাগানো ঘটনা আর তার অদ্ভুত পরিসমাপ্তির কথা কোনওদিন ভুলব না।

কাল এগারোটায় শুয়ে পড়লেও ঘুম আসতে দেরি হয়েছিল। একহাটের প্রতারণার ব্যাপারটা বারবার মনের মধ্যে মোচড় দিচ্ছিল। বোঝাই যাচ্ছে তার বাপের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে সে আমার জন্তুটিকে হাত করার লোভে আমাকে এখানে আনিয়েছে। সে আমাকে যাতায়াতের খরচ দেবে বলেছিল, এখনও দেয়নি। হয়তো ভেবেছিল জন্তুর জন্য বিশ হাজার মার্ক দিলে

সেটা পুষ্টিয়ে যাবে। সে টাকা যে আমি নেব না, সেটা কি একহাট ভেবেছিল?

ঘুমটা এল একেবারে ম্যাজিকের মতো। বাইরে সিঁড়ির নীচে গ্যাস্‌ফাদার রুকে বারোটা বাজতে আরম্ভ করল সেটা শুনেছি, কিন্তু শেষ হওয়াটা আর শুনিনি। অর্থাৎ তারমধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছি।

ঘুমটা ভাঙল মাঝরাতে। প্রথমে মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে; তারপর বুঝলাম আমার শরীরটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা হচ্ছে; আর তারপরেই দেখলাম আমি বন্দি, অনড়। আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে। আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তল বালিশের তলায়, সেটারও নাগাল পাবার জো নেই। ঘরের দেয়ালঘড়িতে চোখ পড়াতে দেখলাম সাড়ে তিনটে। বাইরে পূর্ণিমার আলো, তাই হঠাৎ মনে হয়েছিল বুকি ভোর হয়ে গেছে।

ঘরে অন্তত চার-পাঁচজন লোক সেটা দেখতে পাচ্ছি। একজনের হাতে টর্চ, সেটা আমার দিকে ঘোরানো রয়েছে। পাশের ঘরেও পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি। ইয়ে কি তা হলে—?

‘প্রোফেসর শঙ্কু, তোমার আশ্চর্য জন্তু না মুহূর্তের মধ্যে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে? আত্মরক্ষার অদ্ভুত সব উপায় নাকি চোখের পলকে উদ্ভব করতে পারে? এবারে বোঝা যাবে তার ক্ষমতার দৌড়।’

একহাটের গলা। দরজার মুখটাতে দাঁড়িয়ে আছে সে।

‘শাইনার, শুল্টস—ওকে ওই পাশের ঘরের দরজার সামনে দাঁড় করাও।’

দু’জন লোক আমাকে এক হ্যাঁচকায় বিছানা থেকে তুলে নিয়ে টেনেইচড়ে ইয়ের ঘরের দরজার সামনে নিয়ে গেল।

এই ঘরেও ফিকে চাঁদের আলো, অন্ততপক্ষে ছ’সাতজন লোক, এখানেও টর্চের আলো ঘোরানো করা হচ্ছে। তিনজন লোকের হাতে দড়ি, খালি, জাল—অর্থাৎ জানোয়ার ধরার যাবতীয় সরঞ্জাম। অন্য দু’জন লোকের হাতে ধাতব বস্তুর খালকানি দেখে বুঝলাম আগ্নেয়াস্ত্রেরও অভাব নেই।

কিন্তু বিছানা যে খালি সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

দুটো লোক উপুড় হয়ে খাটের তলায় টর্চ ফেলল। আর সেই মুহূর্তে ঘটল এক তুলকালাম কাণ্ড।

একটা তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ দমকা হাওয়ার মতো আমার নাকে প্রবেশ করে আমার চোখ থেকে জল বার করে দিল। ল্যাবরেটরিস্টের শানান কেমিক্যাল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার ফলে কোনও গন্ধই আমাকে কাবু করতে পারে না; কিন্তু এই বীভৎস গন্ধের যে একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে মানুষকে ঘায়েল করার, সেটা বুঝতে পারছিলাম।

যারা এসেছিল তারা কেউ এ গন্ধ সহ্য করতে না পেরে নাকে রুমাল দিয়ে প্রায় ছটফট করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একহাটও অবশ্য এই দলে পড়েন।

এরপরেই শুনতে পেলাম একহাটের চিৎকার। তিনি বাইরের কোনও একটা জানলা দিয়ে মুখ বার করে বাগানে জমায়েত দলকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, ‘তোমরা অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থেকো—জন্তুটা জানালা দিয়ে পালাতে পারে!’

আমার দৃষ্টি ইয়ের ঘর থেকে একচুল নড়েনি।

এবার খাটের তলা থেকে আমার প্রিয় আশ্চর্য জন্তু বার হয়ে হল। তারপরে এক লাফে বাগানের জানালার সামনে পৌঁছে আরেক লাফে জানালার বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে কি ওই অস্ত্রধারীদের শিকার হতে চলেছে?

না, তা নয়। কারণ এই সংকট মুহূর্তে পালাবার একমাত্র উপায় এই জন্তু উদ্ভব করেছে তার স্বাভাবিক ক্ষমতাবলে। ক্রমবিবর্তনের অমোঘ নিয়ম লঙ্ঘন করে চোখের নিমেষে এই স্থলচর

priyobanlaboi.blogspot.com



চতুস্পদের ডানা গজিয়েছে।

জানালা দিয়ে বেরিয়ে সে নীচের দিকে না গিয়ে বিস্তৃত ডানার সাহায্যে তিরবেগে উঠল উপর দিকে। আমি দৌড়ে গিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম জ্যোৎস্নাস্বীত স্নান আকাশে তার দ্রুত সঞ্চালমান পক্ষবিশিষ্ট দেহ ক্রমে বিন্দুতে পরিণত হচ্ছে। বাগান থেকে পর পর দুটো গুলির শব্দ পাওয়া গেল, কিন্তু এই অবস্থায় বন্দুকের নিশানা ঠিক রাখা কোনও মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

নভেম্বর ১৭

শ্রীমতী এরিকার দৌলতে যুগপৎ আমার মুক্তি, ও বন্ধুসমেত একহাটকে পুলিশের হাতে সমর্পণ—এই দুটোই সম্ভব হয়েছিল।

গিরিডি ফেরার সাতদিন পরে খবরের কাগজে পড়লাম নিকারাগুয়ার গভীর অরণ্যে এক পশুসংগ্রহকারী দল একটি আশ্চর্য নতুন জানোয়ারের সাক্ষাৎ পেয়েছে। এই জানোয়ার নাকি দূর থেকে দাঁড়িয়ে দলের লোকেদের দিকে বারবার সেন্যুটের ভঙ্গিতে ডান হাতটা তুলে কপালে ঠেকাচ্ছিল। কিন্তু তাকে যখন জাল দিয়ে ধরতে যাওয়া হয়, তখন সে চোখের নিমেষে একটা একশো ফুট উঁচু গাছের মাথায় চড়ে ডালপালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। পশু সংগ্রহকারী দল নাকি এই জানোয়ারের লোভে তাদের অভিযাত্রীর মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছে।

জানোয়ারের বর্ণনা থেকে তাকে আমারই ইয়ে বলে চিন্তিতে কোনও অসুবিধা হয় না। এতদিন মানুষের মধ্যে থেকে সে মানুষের স্বভাব আয়ত্ত্ব করেছিল, এখন আবার জঙ্গলের পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। কিছুদিন খোঁজার পরই যে এ অভিযাত্রী দল হাল ছাড়তে বাধ্য হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু ইয়ে কি তা হলে আর ফিরে আসবে না আমার কাছে?

না এলেই ভাল। যতদিন তার আয়ু, ততদিন তার আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়ে সে বেঁচে থাকুক। আমার বৈজ্ঞানিক মনের একটা অংশ আক্ষেপ করছে যে, তাকে ভাল করে স্টাডি করা গেল না, তার বিষয়ে অনেক কিছুই জানা গেল না। সেইসঙ্গে আরেকটা অংশ বলছে যে, মানুষের সব জেনে ফেলার লোভের একটা সীমা থাকা উচিত। এমন কিছু থাকুক, যা মানুষের মনে প্রশ্নের উদ্বেক করতে পারে, বিস্ময় জাগিয়ে তুলতে পারে।

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৯০